শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক পাক্ষিক পত্রিকা

জেলার খবর সমীক্ষা

বর্ষ - ৪, ১৯ তম সংখ্যা, ১লা ফাল্গুন ১৪১৭ (১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১১) মূল্য - ২ টাকা D.L. No.-21 Dt. 05.04.07

সাক্ষাৎকার

‘স্বাস্থ্য অর্থনীতিতে আমাদের দেশ এখনও অনেক পিছিয়ে’

আমরা জানি অর্থনীতির অনেকগুলি শাখা আছে। এরকমই একটি শাখা হল স্বাস্থ্য অর্থনীতি (Health economics) যেটি বর্তমানে বিশ্বের নানা দেশে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। এই শাখায় জনস্বাস্থ্যের বিভিন্ন বিষয় অর্থনীতির মাপকাঠিতে বিচার করা হয়, এবং কী করে সামাজিক নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় করা যায় গবেষণার মাধ্যমে তা ঠিক করা হয়। হাওড়ার রামরাজাতলার বাসিন্দা এবং সাঁত্রাগাছি কেদারনাথ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ডঃ কৌস্তুভ দালাল এই বিষয়ে পৃথিবীর প্রথম সারির একজন বিশেষজ্ঞ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে পৃথিবীর প্রায় ৩৫টি দেশে বিষয়টি প্রচার ও প্রসারের কাজে যুক্ত। সম্প্রতি তিনি হাওড়ায় এলে পত্রিকার তরফ থেকে তাঁর এই সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়।

স্কুলের পাঠ শেষ করে কৌস্তুভ নরসিংহ দত্ত কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন, পরে এম.এস.সি ও পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। একসময় কিছু দিনের জন্য দিল্লী আই.আই.টি. তে পড়ানোর পাশাপাশি গবেষণাও করেছেন। বিষয় ছিল ‘সামাজিক হিংসার কারণে আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি’। ২০০০ সালে তিনি সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট-এ (যেখান থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় নোবেল পুরষ্কার মনোনয়ন হয়) যোগদান করেন এবং অর্থনীতির এই নতুন শাখা নিয়ে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে এই বিষয় নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের মধ্যে পিয়া জোন্স এবং ডঃ দালাল এই বিষয়ে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছেন। কৌস্তুভের গবেষণাপত্র বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (W.H.O.) 'Best scientific paper Award' এ ভূষিত হয়েছিল। বর্তমানে তিনি অধ্যাপনার পাশাপাশি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ প্রয়াসে গঠিত একটি প্রোজেক্ট এর উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'Community Safety Promotion' প্রকল্পের বরিষ্ঠ উপদেষ্টা ও 'W.H.O. Safe Community Monthly' আন্তর্জাতিক মাসিকপত্রের প্রধান সম্পাদক। Health economics বিষয়টি নতুন হওয়ায় সঙ্গত কারণেই সাক্ষাৎকারে এই বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু জানতে চাওয়া হয়েছিল।

প্রঃ আপনার গবেষণার বিষয়টি ঠিক কী রকম?

উঃ Health economics বিষয়টির পরিধি অনেক ব্যাপক, তবে এর প্রধান কাজ হল সামাজিক সুরক্ষার দিকটি নিশ্চিত করা। যেমন ধরুন রাস্তায় দুর্ঘটনা, যাকে আমরা Road accident বলি, নানা কারণে এই দুর্ঘটনা হয়। এর মধ্যে চালকদের অজ্ঞতা, পথচারীদের নিয়ম না মানা, অপরিসর রাস্তা, ওভারটেক করা, যানবাহনের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব প্রভৃতি কারণ রয়েছে যেগুলি সবই মনুষ্যকৃত। পরিসংখ্যানে দেখা যায় ভারত ও চিনে এর প্রবণতা অত্যন্ত বেশী, আমরা গবেষণা করে দেখিয়েছি দুর্ঘটনা রোধে যেসব ব্যবস্থা চালু আছে সেগুলিকেই ঠিক মতো কার্যকর করতে পারলে এই প্রবণতা বছরে সাড়ে তিন শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব।

প্রঃ পৃথিবীর কোনো দেশে কী এটা হয়েছে?

উঃ হ্যাঁ, অবশ্যই - যেমন আমাদের সুইডেনেই পথ দুর্ঘটনা এখন বিরল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া তাইওয়ান, ফিনল্যান্ড, পূর্ব ইউরোপের কিছু দেশ, বসনিয়া, সার্বিয়া, কানাডা, কলম্বিয়া, মেক্সিকো, ইরান প্রভৃতি দেশ আমাদের মডেল নির্দিষ্ট ভাবে গ্রহণ করেছে এবং দুর্ঘটনার হার উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু দেশও এ প্রস্তাবে আগ্রহ দেখিয়েছে।

প্রঃ আপনাদের মডেলের মূল বিষয়টি একটু বুঝিয়ে বলবেন?

উঃ দেখুন দুর্ঘটনা হলেই হাসপাতালের ওপর চাপ সবচেয়ে বেশি পড়ে এবং এই খাতে সরকারের ব্যয় সবচেয়ে বেশি হয়। দুর্ঘটনা কমলে ব্যয় কমে। সেই অর্থ অন্য চিকিৎসার কাজে এই টাকা ব্যয় করা যায়। আবার ধরুন যেকোন অপারেশনের একটি নির্দিষ্ট খরচ আছে কিন্তু বেসরকারী হাসপাতালগুলি বহু ক্ষেত্রেই যেমন খুশি অর্থ আদায় করে। আমাদের গবেষণায় এই খরচের মাত্রা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে হাসপাতালের লাভ ধরেই। সরকার ও মানুষ সচেতন হলে বহু অর্থের সাশ্রয় হয় যে অর্থ চিকিৎসার অন্য কাজে লাগানো যায়।

প্রঃ আর কি কি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনাদের কাজ?

উঃ দেখুন - সামাজিক সমস্যা এক এক দেশে এক এক রকম। যেমন ফিনল্যান্ড, ওখানে মদ খাওয়ার প্রবণতা বেশী। কী করে এই প্রবণতা কমানো যায় তা নিয়ে আমরা গবেষণা করেছি, তা প্রয়োগ করে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছি। আবার তুলনামূলক ভাবে গরীব দেশগুলিতে অপুষ্টি ও দারিদ্রের কারণে নানা রোগের সৃষ্টি হয়। যেমন ধরুন ডাইরিয়া। এক্ষেত্রে আমরা জোর দিই গোষ্ঠী সচেতনতার উপর অর্থাৎ মাত্র কয়েকটি মানুষকে নয় গোটা একটি গোষ্ঠীকে যদি ঠিক ভাবে সচেতন করা যায় তাহলে এ রোগের প্রবণতা কমে যায়। আবার আমেরিকার কিছু জায়গায় বন্দুকবাজদের দাপট বেশী। ফলে অকারণে অনেক নিরীহ মানুষের প্রাণ যায়। সমস্যাটির মূল কারণ কি তা খুঁজে সমাধানের রাস্তাও বাতলে দিয়েছি এবং প্রায়োগিক দিক থেকেও সফল হয়েছি।

প্রঃ ভারতে কী রকম সাড়া পেয়েছেন?

উঃ দুঃখের বিষয় হল সত্যি যে আমাদের দেশ স্বাস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে এখনও অনেক পিছিয়ে। ফলে এই বিষয়ে স্নাতক স্তরে কোন কোর্স চালু করা যাচ্ছে না, যদিও প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ ও মায়ানমার যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছে। কিন্তু অনেক বিশিষ্ট মানুষ এই নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছেন। যেমন ধরুন নোবেল শান্তি পুরষ্কার প্রাপ্ত দশজন বিশিষ্ট ব্যক্তি একটি সংস্থা তৈরী করেছেন ‘Centre for Non Kiling Public Health’ এবং নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন পৃথিবীকে সামাজিক হিংসা মুক্ত করতে।

সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন **শান্তনু ভট্টাচার্য্য**

৭ম পর্ব

প্রসঙ্গ ঃ হাওড়ার উন্নয়ন

প্রকাশ গুপ্ত

গত সংখ্যায় জি.টি. রোডের কিছু অংশের অব্যবস্থার কথা আলোচিত হয়েছে। সালকিয়ার দিকে এই রাস্তার কি হাল তা শহরবাসী মাত্রেই জানেন। এই সংখ্যায় আলোচনা করা যাক শহর থেকে একটু দূরের দু’একটি রাস্তা নিয়ে। দিন কয়েক আগে একটি কাজে আঁটপুর যেতে হয়েছিল। হাওড়া থেকে রাজবলহাটের মাত্র একটি বাসই সরাসরি আঁটপুর যায়। সেদিন ঐ বাস বন্ধ ছিল। অগত্যা বড়গাছিয়া লেবেল ক্রসিং-এ নেমে স্থানীয় ইঞ্জিন ট্রলি ভ্যানই ভরসা করতে হল। বড়গাছিয়া থেকে জগৎবল্লভপুর হাই স্কুল পর্যন্ত গোটা রাস্তাটির যা দূরবস্থা তা কহতব্য নয়। প্রায় কুড়ি ফুট চওড়া রাস্তাটির সম্পূর্ণ অংশই ভাঙাচোরা খানাখন্দে ভর্তি। অবস্থা এমনই যেকোন মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে অথচ এই রাস্তার দু’ধারেই প্রয়োজনীয় সরকারী অফিস, কলেজ, পোষ্ট অফিস এবং বড় মাপের একটি হাসপাতাল। সাধারণ মানুষের নিত্য যাতায়াত এই খন্দ পথ ধরেই। তড়ার মোড় পর্যন্ত গোটা রাস্তাটির অবস্থা একই। আঁটপুর সুপ্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র হলেও পর্যটকদের কাছে আজও রীতিমত দুর্গম পরিবহন দপ্তরের উদাসীনতার কারণে। আগে আঁটপুর পর্যন্ত একটি সি.টি.সি. বাস চলত, বর্তমানে সেটি বন্ধ হয়ে গেছে। আঁটপুর থেকে রাজবলহাট যাবার রাস্তাটি বাস চলাচলের অনুপযোগী কারণ যথেষ্ট চওড়া নয়, ফলে স্থানীয় ট্রেকারই ভরসা। এই সব ট্রেকার এক সঙ্গে প্রায় চল্লিশ জন যাত্রী বহন করে। এক ট্রেকার চালকের কাছে জানা গেল, এটি রীতিমতো লোভনীয় ব্যবসা কারণ এ পথে পরিবহণ দপ্তরের কর্তাদের নজরদারী নেই। তড়ার মোড় থেকে আর একটি রাস্তা চলে গেছে হরিপালের দিকে। এ পথেও ট্রেকার ভরসা এবং রাস্তার অবস্থা যথেষ্ট খারাপ।

তবে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা রাজবলহাট থেকে উদয়নারায়ণপুর যাওয়ার রাস্তাটির। জায়গায় জায়গায় পিচ বসে যাওয়ায় ঢেউ খেলানো রাস্তায় অনেকটা নৌকা ভ্রমণের মতো ট্রেকারের নিত্য যাতায়াত। গর্ত, খানা খন্দে ভরা রাস্তায় সন্ধ্যার পর কোন আলো চোখে পড়েনা। কত কাল এই রাস্তায় পিচ পড়েনি এবং কেন তা জেলা পরিষদের কর্তারাই ভালো বলতে পারবেন। তুলনায় সিংটি থেকে সোজা উদয়নারায়ণপুর যাওয়ার রাস্তাটির অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো। কিন্তু রাজবলহাট থেকে বহু মানুষ নানা কাজে নিত্যদিন উদয়নারায়ণপুর যাতায়াত করেন। স্থানীয় মানুষজনের কাছে জানা গেল এই রাস্তাটি সারানোর ব্যাপারে প্রশাসনিক কোন উদ্যোগ বিগত পাঁচ বছরে নজরে আসেনি। নতুন কোন বাসরুটও চালু হয়নি। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে আঁটপুর এবং তৎসংলগ্ন টেরাকোটার মন্দিরগুলি জেলার পর্যটন মানচিত্রে আজও উপেক্ষিতই রয়ে গেছে।

‘জেলার খবর সমীক্ষা’র গ্রাহক হন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৪৫ টাকা

লেখা পাঠান, মনোনীত হলে তা প্রকাশ করা হবে।

পত্রিকা সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত জানান।

যোগাযোগ করুন -- সম্পাদকীয় দপ্তরে

গ্রাম ও পোঃ - অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া। ফোন - ৯৮০০২৮৬১৪৮

‘শিক্ষা আনে চেতনা’

সম্পাদকীয়

জন্মলগ্ন থেকেই হাওড়া শহর অপরিকল্পিত ভাবে গড়ে উঠেছে। ব্রিটিশ আমলে রাজধানীর সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও এবং হাওড়ায় নানা ভারী শিল্পের পাশাপাশি ছোটখাটো শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটলেও এই শহরের সামগ্রিক উন্নতির দিকে ইংরেজ সরকার নজর দেয়নি। অথচ এখানে গঙ্গার ধারে ১৮৬০ সালের পর থেকে একের পর এক গড়ে উঠেছিল চটকল, ময়দা কল ও কাপড়ের মিল। সঠিক অর্থে বলা যায় উইলিয়াম জোন্স যাঁকে সেকালে বলা হত গুরু জোন্স, তাঁর হাত ধরেই এ শহরে শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। গঙ্গার ধারে সেকালের বিখ্যাত অ্যালবিয়ন মিলস তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ শহরের গর্ব সবেধন নিলমণি বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেরও স্থপতিকার ছিলেন তিনিই। আজ সে খবর কে রাখে! জোন্স এর কোন স্মৃতি এ শহরে রক্ষিত হয়নি। ঠিক যেভাবে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে হারিয়ে যেতে বসেছে প্রাচীন মন্দির মসজিদ সহ অনুপম স্থাপত্য কীর্তিগুলি (যার মধ্যে রয়েছে একাধিক উল্লেখযোগ্য রাজবাড়ী)। ঠিক সেভাবেই হারিয়ে গেছে জোন্সের মত কৃতী অসংখ্য মানুষের স্মৃতি। ব্রিটিশ রাজত্বকালে শুধু রাজস্ব আদায়ের কারণেই শহরের কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলের উন্নতি সাধন করা হয়েছে। সামগ্রিক ভাবে এই শিল্প শহরটির উন্নতির দিকে কোন মনোযোগ দেওয়া হয়নি। দেশ স্বাধীন হবার পরও চিত্রটি একই রয়ে গেছে। এশহরের সামগ্রিক উন্নতি নিয়ে নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা আজও হয়নি। কথায় বলে সদিচ্ছা থাকলে অর্থের অভাব হয়না। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই নানা খাতে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ জেলা স্তরে বেড়েছে। কয়েক বছর আগে বিদেশী অনুদানের আশায় একটি খসড়া পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই শেষ। এশহরে আজও নেই কোন মেডিকেল কলেজ। গ্রামাঞ্চলের ছেলেমেয়েদের জন্য নেই কোন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা বেড়েছে যদিও অধিকাংশ গ্রামেই তা বেহাল, জনসংখ্যার অনুপাতে বাড়েনি সরকারী হাসপাতাল, শহরে মেয়েদের নিজস্ব একটি মাত্র কলেজ। পড়ুয়ার সংখ্যা অনুপাতে বাড়েনি কলেজের সংখ্যাও। শহরে ও শহরতলিতে আগের তুলনায় লোকজনের যাতায়াত অনেক বেড়েছে, বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত মহিলার সংখ্যা অনেক বেড়েছে কিন্তু সভ্য সমাজের মধ্যে থাকা জনগণের জন্য শহরের মধ্যে যৎসামান্য কয়েকটি সুলভ শৌচাগার থাকলেও শহরের বেশির ভাগ জায়গায় সেটি নেই। অথচ জেলার প্রায় প্রত্যেকটি গ্রাম এখন নির্মল পুরস্কার পেয়েছে। থানার সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু পুলিশের সংখ্যা বিশেষত মহিলা পুলিশের সংখ্যা সে তুলনায় বাড়েনি, বস্তুত গ্রামাঞ্চলে তাদের দেখা মেলে না। এ শহরের পরিচালকমন্ডলী বিষয়গুলি ভেবে দেখবেন কি?

ফোন - ৯৭৭৫১৩০৩২০

মর্ডান ডিজিটাল স্টুডিও এ্যান্ড জেরক্স সেন্টার

প্রো ঃ বিমল দোলুই

জয়পুর মোড় (থানার নিকট) হাওড়া

এখানে ভিডিও ফটোগ্রাফি, স্টীল ফটোগ্রাফি, মিক্সিং ও জেরক্স করা হয়।

৫ মিনিটে পাসপোর্ট ছবি পাওয়া যায়।

যাঁদের নিয়ে হাওড়ার ইতিকথা

অলোককুমার মুখোপাধ্যায়

আগের সংখ্যার পর

বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় ঃ হাওড়ার বেলুড়বাসী যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯৭ সালে। হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশুনা করে উত্তরপ্রদেশের এটোয়াতে শিক্ষাকতা করেন। ১৯২১ সালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলে কারাবাস হয়।

পরে মতিলাল নেহেরুর নির্দেশে বাংলায় ফিরে আসেন ও স্বরাজ্য পার্টির প্রচারক - বক্তা নিযুক্ত হন। ১৯৩০ সালে তিনি আবার আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। পরে ১৯৩৬ সালে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় সর্বভারতীয় কিষাণ সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিপ্লবী রাজনীতিক ব্যক্তিত্বের মৃত্যু হয় ১৯৬১ সালে।

বটকৃষ্ণ পাল ঃ হাওড়ার বিখ্যাত ঔষধ ব্যবসায়ী বটকৃষ্ণ পাল যিনি বি.কে.পাল নামে বিশেষ পরিচিত, তাঁর জন্ম শিবপুরে ১৮৩৫ সালে এক গন্ধবণিক পরিবারে। মাত্র বারো বছর বয়সে বটকৃষ্ণ কোলকাতায় তাঁর মামার মশলার দোকানে কাজ করতে ঢোকেন। পরে পাটের ব্যবসা ও ১৮৫৬ সালে বড়বাজারে খেংরাপট্টিতে নিজের মশলার দোকান খোলেন। উৎসাহ ও উদ্যমের ওপর ভর করে তিনি ঔষধ তৈরি ও বিক্রি শুরু করেন। এই দেশীয় পদ্ধতিতে ঔষধ তৈরির ব্যাপারে তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যালস এরও অগ্রণী। ব্যবসায় প্রচুর অর্থ উপায় করলেও তিনি ছিলেন দয়ালু ও দাতা। সুযোগের অভাবে নিজের তেমন লেখা পড়া না হলেও তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। হাওড়ার শিবপুরে ও কোলকাতার বেনিয়াটোলাতে স্কুল খোলেন। শিবপুরের প্রাচীন স্কুলটি বি.কে.পাল ইনস্টিটিউশন নামে পরিচিত। ১৯১৪ সালে ৭৯ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

বরদা পাইন ঃ অমৃতলাল পাইনের পুত্র হাওড়ার নামী আইনজীবী বরদা পাইনের জন্ম ১৮৮১ সালে। তিনি দীর্ঘকাল হাওড়া পৌরসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এনাদের আদি বাড়ি ছিল খানাকুলে। বরদা পাইনের প্রপিতামহ বিশ্বম্ভর পাইন (পানি) খানাকুল ছেড়ে হাওড়ায় আসেন ১৭৪০-৪৫ সাল নাগাদ। বিশ্বম্ভরের পুত্র তারাপদ ও পৌত্র অমৃতলাল। অমৃতলাল সরকারী উকিল ছিলেন এবং হাওড়া কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। বরদাপ্রসন্ন পাইন লীগ মন্ত্রী সভার সদস্য তাছাড়া পূর্ত ও যোগাযোগ দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। সুভাষচন্দ্র, গান্ধীজী, শরৎচন্দ্র এমনকি লাজপৎ রায় তাঁর বাড়িতে আসেন। ১৯৭৫ সালে বরদা পাইনের মৃত্যু হয়।

বরদাপ্রসাদ মজুমদার ঃ উমাচরণ মজুমদারের পুত্র বরদাপ্রসাদের জন্ম হাওড়ার পাঁতিহালে ১৮৩২ সালে। অল্প বয়সে পিতাকে হারিয়ে বরদাপ্রসাদ থাকতেন কাশীতে, তাঁর মায়ের সঙ্গে। পরে তিনি কোলকাতায় এসে তারানাথ বাচস্পতি প্রভৃতি পন্ডিতজনের সহায়তায় ‘‘কাব্য প্রকাশিকা’’ ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহ প্রকাশ করেন। তিনি নিজের নামে বি.পি.এম. প্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা ইংরেজি ও সংস্কৃত বই এর ব্যাখ্যা (মানে বই) তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন। ১৯১২ সালে ৮০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

ক্রমশ

সার্ধশতবর্ষে নীলদর্পণ

গৌরাঙ্গ সেনগুপ্ত

সার্ধশত বর্ষ। ব্যাপারটি আমাদের বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় আজ আর চমক সৃষ্টি করে না। ইংরাজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২০১০ সালটি আমাদের বাংলা সাহিত্যে উপহার দিয়েছে তিন তিনজন স্মরণীয় বরণীয় ব্যক্তিত্বের সার্ধশতবর্ষ -- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং বাংলার প্রথম মহিলা স্নাতক এবং প্রথম মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়কে। সারাটি বছর ধরে এঁদের সম্বন্ধে আমরা যেমন বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে ঋদ্ধ হয়েছি তেমনি তাঁদের প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে ধন্য হয়েছি।

এ তো গেল বাংলা সাহিত্যের তিনজন স্মরণীয় বরণীয় ব্যক্তিত্বের সার্ধশত বৎসরের কথা। এবার আমাদের আলোচনার বিষয় বাংলা সাহিত্যে দুটি অসামান্য মহাকাব্য এবং নাটক। প্রথমটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত ‘মেঘনাদবধ’ কাব্য এবং দ্বিতীয়টি হ’ল নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র-এর নাটক ‘নীলদর্পণ’।

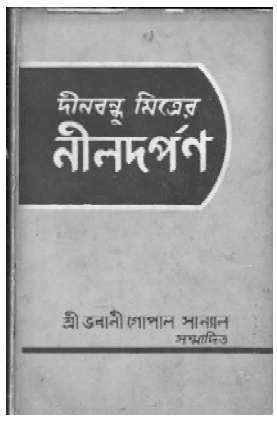

১৮২৯ সালে দীনবন্ধু নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে পিতা কালাচাঁদ মিত্রের সংসারে জন্মগ্রহণ করেন। মাসটি ছিল ডিসেম্বর। প্রথমে হুগলী কলেজ এবং পরে কলকাতার হিন্দু কলেজে পাঠ শেষ করে নিজ বিচক্ষণতায় ডাকবিভাগের উচ্চপদে যোগদান করে যথেষ্ট কর্মদক্ষতার পরিচয় দিলে সরকার ১৮৭১ সালে দীনবন্ধুকে লুসাই যুদ্ধে পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং পরের বছরই অর্থাৎ ১৮৭২ সালে সরকার দীনবন্ধুর ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ‘রায়বাহাদুর’ খেতাব প্রদানে সন্মানিত করেছিল।

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রর এই প্রাথমিক পরিচয়ের পর আসা যাক বর্তমান আলোচনার বিষয় ‘নীলদর্পণ’ নাটকের কথায়। আঠেরো শতকের শেষ পর্যায় বা ঊনিশ শতকের প্রথম থেকেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতের মাটিতে নীলচাষের ব্যবসা শুর করেছিল। কারণ ভারতের এই মাটি যেমন উর্বর ছিল নীলচাষের পক্ষে তেমনি চাষীদের উপরে অকথ্য অত্যাচার করে জমি দখলে তাদের কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। এভাবেই তৎকালীন বণিক সমাজ নীলচাষের ব্যবসা চালাত।

এদিকে ১৮৭২ সালে সরকার প্রদত্ত ‘রায় বাহাদুর’ খেতাব-এ সন্মানিত হলেও দীনবন্ধু মিত্র স্বাভাবিক ভাবেই যেমন সাহিত্যচর্চা করতেন পরবর্তীকালেও নিয়মিত সাহিত্যচর্চায় মগ্ন ছিলেন। আর সেই সাহিত্যের সূত্র ধরেই তৎকালীন ‘সংবাদ প্রভাকর’-এর স্বনামধন্য সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। ১৮৫৬ সালে নীলকরদের অত্যাচার এতই তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে সেই অকথ্য অত্যাচারের যোগ্য জবাব দেবার জন্যে ১৮৫৯ সালে যে গণবিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল ঐতিহাসিকদের মতে এই বিদ্রোহই ভারতের মাটিতে প্রথম গণ-বিদ্রোহ। এই গণ-বিদ্রোহই আজ বাংলা সাহিত্যে প্রথম গণ-বিদ্রোহ বলে পরিচিত। সেই সময়টা ছিল ১৮৬০ সাল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই গণ-বিদ্রোহের পিছনে ছিলেন যশোহরের তৎকালীন স্বনামধন্য শিশির কুমার ঘোষ, বাবু বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস, দিগম্বর বিশ্বাস প্রমুখ এবং তাই-ই নয়, এই গণ-বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে দীনবন্ধু মিত্র তাঁর বিখ্যাত যে নাটক ‘নীলদর্পণ’ লেখেন পরের বছর সেই ‘নীলদর্পণ’ -এর ইংরাজি অনুবাদ করে রেভারেন্ড জেমস লঙ রাজরোষে পড়ে কারাদন্ড ভোগ করেছিলেন। এক বাঙালী নাট্যকারের নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ করে কোন ইংরেজের একমাস কারাদন্ড ভোগ করার ইতিহাসও এই প্রথম এবং নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

স্বল্প পরিসরে সার্ধশত বৎসর অতিক্রান্ত ‘নীলদর্পণ’ নাটকের প্রাথমিক আলোচনা করে নাট্যকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মরণ করি সেই সব অত্যাচারিত চাষীভাইদের! সবশেষে বলি - সেই ট্র্যাডিশান সমানে চলছে।

ফিরে দেখা - জেলা হাওড়া (অষ্টাদশ পর্ব)

সুকান্ত মুখোপাধ্যায়

আগের সংখ্যার পর

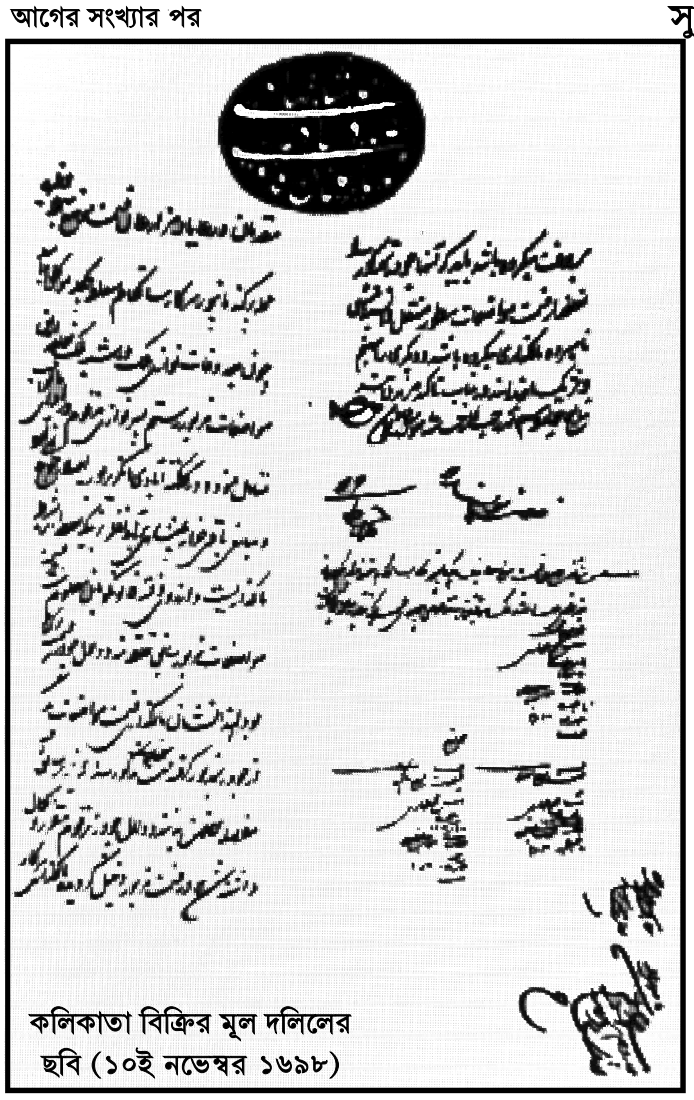

কলিকাতা বিক্রির মূল দলিলের ছবি (১০ই নভেম্বর ১৬৯৮)

সুতানুটিতে জোব চার্নকের পাকাপাকি বসবাস নির্বিঘ্নে হয়নি, এর মূলে ছিল বন্দুকের রণহুঙ্কার। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত তাঁর 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন এইভাবে - ''ইংরাজদিগের আগমনের পূর্বে লালদীঘিতে দোলযাত্রার বড় ঘটা হত। এই লালদীঘি গোবিন্দপুরবাসী মুকুন্দরাম শেঠ বা তাঁর পুত্রের খোদিত, ইহার পশ্চিমপাড়ে গঙ্গাতীরে তাঁহার ইষ্টক নির্মিত কাছারিবাড়ী ছিল .... ইংরেজরা দ্বিতীয়বার সুতানুটিতে যখন বসেন তখন তাঁহাদের অতি দূরবস্থা, কেহ তাঁবুতে কেহ কেহ জাহাজের উপর বা নৌকায় বাস করিতেন। তাঁহারা এই দোলের উৎসব দেখিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু ভিতরে প্রবেশের অনুমতি না পাইয়া বল প্রয়োগ করিয়া প্রবেশের চেষ্টা করায় দেশীয়রা উত্তম মধ্যম দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণে জব চার্নক স্বয়ং সদলে

বাংলার প্রথম সার্ভেয়ার জেনারেল **James Rennel** এর তৈরী করা সার্ভে ম্যাপ (১৭৭২)-এ প্রথম উলুবেড়িয়া নামের উল্লেখ, **Oulubarya** (গোল চিহ্নের মধ্যে দেখানো হয়েছে)।

বন্দুক লইয়া উপস্থিত হন। বন্দুকের শব্দ শুনিয়া দোলযাত্রীরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলে চার্নক সাহেব উক্ত কাছারিবাটী দখল করিয়া আপনাদের দপ্তরখানা আনিয়া ঐ বাটীতে স্থাপন করেন।''

যাই হোক ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সুতানুটিতেই তাদের কেল্লা স্থাপন করতে চেয়েছিল। ১৬৯৬ তে যখন চন্দ্রকোণার জমিদার শোভা সিং মোঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সেই সময় নবাব বিদেশী কোম্পানীগুলিকে তাদের কুঠি তৈরীর অনুমতি দেন। সেই সুযোগেই ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ তৈরীর প্রাথমিক পরিকল্পনা নেওয়া হয় (প্রকৃতপক্ষে ১৭১২-১৭৭৭ এর মধ্যে দুর্গ তৈরীর কাজ শেষ হয়ে যায়)। ১৬৯৮ সালে তৎকালীন সুবাদার ঔরঙ্গজেবের নাতি আজিম-উস-সান কে ১৬০০০ টাকা ভেট দিয়ে ইংরেজরা সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের কাছ থেকে কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের জমিদারী স্বত্ব কিনে নেয় মাত্র ১৩০০ টাকায়। চার্নকের উত্তরসূরী চার্লস আয়ারের সই করা এই দলিলটির তারিখ ১০ই নভেম্বর ১৬৯৮।

জোব চার্নকের জীবনকাহিনী এত সবিস্তারে আলোচনা করার প্রয়োজন কি, অর্থাৎ ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়ার কারণ কি এ প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগতে পারে। চার্নক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার মূল কারণ হল তৎকালীন পরিস্থিতিকে একবার অবলোকন করে নেওয়া। আসলে মূল প্রশ্নটি হল চার্নক উলুবেড়িয়া ছেড়ে সুতানুটিকে বেছে নিয়েছিলেন কেন? 'শিবপুর কাহিনী'র রচয়িতা অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের হাওড়ার ইতিহাস রচয়িতারা (তারাপদবাবু ছাড়া) প্রায় সকলেই এই ধারণা পোষণ করেছেন যে কলকাতার বদলে হাওড়া বা উলুবেড়িয়াই হতে পারত রাজধানী শহর -- তাতে করে হয়ত আজকের হাওড়ার এই শ্রীহীন দশা হত না।

এই লেখায় ব্যবহৃত সমস্ত তথ্য ও ছবি লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে নেওয়া। এর যে কোন অংশ পুনঃপ্রকাশ বা নকল করার ক্ষেত্রে লেখকের অনুমতি প্রয়োজন।

ক্রমশ

আয়কর কোনো সমস্যাই নয়

চতুর্থ পাতার পর

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আয়কর বা তার রিটার্ন কোথায়, কি ভাবে দেবেন?

আয়কর আই.টি.এন.এস. চালান নং ২৮০তে ভরে নিকটবর্তী কোনো স্টেট ব্যাঙ্ক বা অনুমোদিত যে কোনো ব্যাঙ্ক বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে দেওয়া যেতে পারে। বর্তমানে on line payment এর সুবিধাও নেওয়া যেতে পারে। আয়কর বা তার রিটার্ন দিতে গেলে যে জিনিষটা সব চাইতে প্রথমে দরকার তা হোলো প্যান কার্ড (PAN CARD)। বর্তমানে ১০ সংখ্যার সুন্দর দেখতে শক্তপোক্ত প্যান কার্ড ১০০ টাকার মধ্যে সরকার অনুমোদিত সংস্থার মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে। তাতে আপনার ছবি ও সই থাকবে। একের বেশী প্যান কার্ড রাখা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। **প্যান কার্ড বানালেই যে আয়কর বা তার রিটার্ন দিতে হবে এর কোন মানে নেই**। যে কোন বয়সের ভারতীয় নাগরিক তা বানাতে পারেন। বর্তমানে প্যান কার্ড সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য একটি দরকারী পরিচয়পত্র।

চাকুরীজীবি বা পেনশনভোগী ব্যক্তি আই.টি.আর -১ [ITR-1], ব্যবসা বা পেশাগত আয় নেই এমন ব্যক্তি আই.টি.আর-২ [ITR-2], অন্যান্য উৎস থেকে আয়ের ব্যক্তি আই.টি.আর-৩ [ITR-3] ও ব্যবসা বা পেশাগত আয়ের ব্যক্তি আই.টি.আর - ৪ [ITR-4] রিটার্ন ফর্মে তাঁদের আয়কর রিটার্ন জমা দেবেন। বর্তমানে ইন্টারনেটে 'ই- ফাইলিং' এর সুবিধা নিতে পারেন। ভবিষ্যতে ম্যানুয়াল ফর্মে রিটার্ন জমা দেওয়া বন্ধই হয়ে যাবে, তাই সময় থাকতেই e-filing সমন্ধে জেনে রাখা ভালো।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে *বর্তমানে আয়কর রিটার্নের সাথে কোন রকম কাগজপত্রাদি জমা দিতে হয় না, কেবলমাত্র রিটার্ন ফর্ম ভালোভাবে পূরণ করলেই চলবে। টি.ডি.এস. সংক্রান্ত সার্টিফিকেটের প্রতিলিপির কপিও রিটার্নের সাথে দেওয়ার প্রয়োজন নেই*।

তবে যখনই আয়কর রিটার্ন দাখিল করবেন অতি অবশ্যই সমস্ত হিসাব নিকাশের ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রাদি নিজের সংগ্রহে কম করে আট বৎসর রাখবেন।

আয়কর রিটার্ন ম্যানুয়াল ফর্মে জমা দেওয়ার জন্য সাধারণত চাকরীজীবিরা ব্যাঙ্কশুভিলায়, ১৬৯ আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড, কলিকাতা-১৪ (ফোন নং ২২৮৪-২৩৮০/০০১৩/৪৬৪৯/৬৫১৭, হাওড়া নিবাসী ব্যবসাদার ও অন্যান্য আয়করদাতারা ৩নং গর্ভমেন্ট প্লেস, কলিকাতা - ১ (ফোন নং ২২৪৮-৪৪৩২/২৩৮৪-৮৬/২৫৫৪/৩৪৪১/২৩৮৮), ডাক্তারবাবুরা ৫৪/১, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড, কলি-১৬ (ফোন নং ২২২৯-৮১৫২/৮১৫০/১৩৯৪/০৫৬২) যে সমস্ত আয়কর অফিস আছে সেখানে যোগাযোগ করতে পারেন।

কোন ব্যক্তি নিজে পড়াশোনা করে বা আয়কর দপ্তরের সাহায্য নিয়ে অথবা কোন ভাল আয়কর পরামর্শদাতার পরামর্শ নিয়ে তাঁর আয়কর সংক্রান্ত কাজকর্ম করতে পারেন, **কিন্তু কোন অবস্থাতেই কোন দালাল বা ঐ শ্রেণীর মানুষের কাছে আয়কর সংক্রান্ত কাজকর্ম করাবেন না**। প্রয়োজনে **www.incometaxindia.gov.in** ওয়েবসাইটিও দেখবেন।

আয়কর সত্যিই কোন সমস্যা নয়, একটা কথা মাথায় রাখা দরকার যে আমাদের দেশের আয়কর দপ্তর সবসময় সৎ নাগরিকের পাশে সবরকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ভয় না পেয়ে এগিয়ে আসুন, সৎ নাগরিক হিসাবে সঠিক সময়ে আয়কর দিয়ে আপনার কর্তব্য পালন করুন।

লেখক আইনজীবি, ট্যাক্স কনসালট্যান্ট

আয়কর বিষয়ে আরও কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে পত্রিকা দপ্তরে চিঠি লিখতে পারেন - সম্পাদক

প্রসঙ্গ আয়কর

আয়কর কোনো সমস্যাই নয়

সন্দীপ ঘোষ

একটা সময় ছিল যখন কোনো এলাকায় হাতে গোনা গুটিকয় ব্যক্তির কাছেই ইনকাম ট্যাক্স (আয়কর) ফাইল থাকত এবং তাঁরাই সম্ভবত আয়কর আইন সম্বন্ধে সম্যক ধারণা রাখতেন। সেই সময়ের আয়কর দাতারাও খুব ভয়ে ভয়ে থাকতেন, এই বুঝি একটা গোলমাল হল। বছর বছর আয়কর আইনের বিভিন্ন ধারা উপধারার ধাক্কা সামলাতে সামলাতে ওনারাও বেশ কাহিল হয়ে পড়তেন। সেই দেখাদেখি, সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষ ছাড়া অন্যান্যরা বোধকরি আয়কর বিষয়টিকে এড়িয়েই যেতেন।

কিন্তু এখন সময় অনেকটাই বদলেছে, বদলেছে আমাদের মানসিকতাও। তাই খুব সাধারণ মানের ব্যবসাদার বা চাকরিজীবিও স্বেচ্ছায় আয়কর রিটার্ন দাখিল করেন। মোদ্দা কথা ভয় অনেকটাই কেটেছে, একজন ভারতীয় নাগরিক হিসাবে এটা আমাদের কাছে খুব গর্বের বিষয়। ০৪.০৮.২০১০ পর্যন্ত Assessment year ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ তে ২৫,৩৩,৯৭৭ জন ভারতীয় নাগরিক, কোম্পানী ও বিভিন্ন ফার্ম তাঁদের আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছেন। এর মধ্যে ১২,২২,২৭৫ জন চাকরীজীবি, যাঁদের অধিকাংশেরই আয়ের উৎস মূলে আয়কর কেটে নেওয়া হয়, অর্থাৎ তাঁরা একপ্রকার বাধ্যই হন আয়কর দিতে বা রিটার্ন ফাইল করতে। *এই পরিসংখ্যান থেকে এটি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এখনও মোট উপার্জনকারী জনসংখ্যার সিংহ ভাগ মানুষই আয়কর দেওয়া বা আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রক্রিয়ার বাইরে থাকতেই বেশী পছন্দ করছেন।*

আয়কর আইনটির জটিলতা এর একমাত্র কারণ নয়। এই আইন সম্বন্ধে আমাদের স্বচ্ছ ধারণার ও সদিচ্ছার বড়ই অভাব রয়েছে। মনে হয় এটাই মূল কারণ। আসুন খুব সংক্ষেপে এই আইন ও তার কতকগুলি বিষয়ের দিকে আলোকপাত করা যাক।

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার ভিত মজবুত করার জন্য, ভারত সরকার প্রচুর পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ বা খরচ করেন বড় শিল্পাঞ্চল ও পরিকাঠামো গঠনে, ডিফেন্স, অন্তবর্তী নিরাপত্তা, শিক্ষা, দারিদ্র দূরীকরণ, কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভিন্ন খাতে। আর এই বিশাল কর্মযজ্ঞে যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় তার একটি প্রধান উৎস হচ্ছে নানান ধরনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর।

প্রত্যক্ষ কর বা Direct tax এর মধ্যে থাকে আয়কর, সম্পত্তি কর ইত্যাদি। এই আয়কর থেকে প্রাপ্ত অর্থ ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ভাগ হয়ে যায় ও তা সরাসরি সাধারণ জনগণের জন্যই উভয় সরকার খরচ করে থাকেন। কখন কখনও আয়করের উপরও সারচার্জ বসানো হয় বিশেষ কিছু বিষয়ের খরচা তোলার জন্য, সেক্ষেত্রে ভারত সরকারই কেবলমাত্র তা খরচা করেন সেই নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য।

তাহলে বোঝা গেল আয়কর দান কতটা সমাজ সংগঠনের জন্য উপকারী এক মহান দান। একে এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ নিজেকে নিজেই দেশের এক মহান কর্তব্য থেকে বঞ্চিত রাখা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কে বা কারা, কখন, কি হারে আয়কর দেবেন?

বিগত অর্থবর্ষে (০১.০৪.২০০৯ থেকে ৩১.৩.২০১০) বা Financial year 2009-10 এ অর্থাৎ Assessment year 2010-11 য় যে সমস্ত ভারতীয় পুরুষ ১,৬০,০০০/- টাকা, ভারতীয় মহিলা ১,৯০,০০০/- টাকা, বরিষ্ঠ ভারতীয় নাগরিক (*সিনিয়ার সিটিজেন*) ২,৪০,০০০/- টাকার (*আয়কর আইন, ১৯৬১ অনুযায়ী ৬৫ বৎসর অতিক্রান্ত ব্যক্তিই হচ্ছেন সিনিয়ার সিটিজেন*) উর্দ্ধে আয় করেছেন, কেবলমাত্র তাঁরাই আয়কর দেবেন ও রিটার্ন দাখিল করবেন (*এখানে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আয়করের হিসাবই দেওয়া হচ্ছে*)। সুদসহ ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্ন দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১শে মার্চ ২০১১, তার পরেও ৩১শে মার্চ ২০১২ অবধি রিটার্ন দেওয়া যেতে পারে, সে ক্ষেত্রে আপনাকে দেরীতে রিটার্ন জমা দেওয়ার কারণ দর্শানোর নোটিশ আয়কর দপ্তর দিতে পারেন ও ৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। আয়করের হার হোলো ঃ

১,৬০,০০০/- থেকে ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ১০% (দশ শতাংশ);
৩,০০,০০০/- থেকে ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ২০% (কুড়ি শতাংশ);
৫,০০,০০০/- টাকার উর্দ্ধে ৩০% (ত্রিশ শতাংশ);

চলতি অর্থবর্ষে (০১.০৪.২০১০ থেকে ৩১.০৩.২০১১) Financial year 2010-11 বা previous year 2010-11 এ অর্থাৎ Assessment year 2011-12 য় আয়করের হার এ'রকম ঃ ১,৬০,০০০/- থেকে ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ১০% (দশ শতাংশ);
৫,০০,০০০/- থেকে ৮,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ২০% (কুড়ি শতাংশ);
৮,০০,০০০/- টাকার উর্দ্ধে ৩০% (ত্রিশ শতাংশ);

Assessment year 2011-12 য় চাকরীজীবি বা ব্যবসাদার বা পেশাদার ব্যক্তি বা অন্যান্য উৎস থেকে আয়ের ভারতীয় নাগরিকদের আয়কর রিটার্ন দাখিলের তারিখ হ'ল ৩১শে জুলাই ২০১১ এবং কোম্পানী বা কোন ব্যবসা বা পেশার ব্যক্তি, যাঁদের হিসাব নিরীক্ষা করা (Accounts auditing) বাধ্যতামূলক তাঁদের আয়কর রিটার্ন সুদসহ দাখিলের তারিখ হ'ল ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১১।

বিধিবদ্ধ সময়ের যত পরে রিটার্ন ফাইল করা হবে তার হিসাব অনুযায়ী প্রতি মাসে ১ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে। অগ্রিম কর দিতে দেরী হলেও প্রতি মাসে ১ শতাংশ হারে সুদ লাগবে।

আয়কর আইনে মোট করযোগ্য আয় থেকে কিছু ছাড়ের (deductions) কথা বলা আছে। যেমন - **৮০সি ধারা** অনুযায়ী সর্বাধিক ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ছাড় পাওয়া যেতে পারে। এই ছাড় প্রযোজ্য হবে- জীবনবীমা, ন্যাশানাল সেভিংস সার্টিফিকেট, পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড, হোম লোনের কিস্তি, ব্যাঙ্ক বা পোষ্ট অফিসে ৫বৎসরের অধিককালের জন্য জমা টার্ম ডিপোজিট, টিউশন ফি (*পূর্ণ সময়ের কোর্সের জন্য সর্বাধিক দুটি সন্তানের জন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল ইত্যাদির ফি বাবদ প্রদেয় অর্থ*) ইত্যাদি যে কোন ক্ষেত্রে।

৮০ সি সি এফ ধারা অনুযায়ী উক্ত ১,০০,০০০/- টাকা ছাড়াও বাড়তি ২০,০০০/- টাকা ছাড় পাওয়া যেতে পারে যদি কোনো নোটিফায়েড দীর্ঘ মেয়াদী ইনফ্রাস্টাকচার বন্ডে বিনিয়োগ করা যায়।

৮০ ডি ধারা অনুযায়ী উক্ত ১,২০,০০০/- টাকা ছাড়াও যে কোনো মেডিক্লেম পলিসিতে বিনিয়োগের উপর সর্বাধিক ১৫,০০০/- টাকা (*সিনিয়ার সিটিজেন সর্বাধিক ২০,০০০/- টাকা*) পর্যন্ত ছাড় পাওয়া যেতে পারে।

৮০ জি ধারা অনুযায়ী আপনি যে কোন সরকারী বা অন্য কোনো ধর্মীয় বা সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে দান করা অর্থের সম্পূর্ণ ১০০ শতাংশ বা ৫০ শতাংশ ছাড় পাবেন। তবে দানের নমুনা হিসাবে একটি রসিদ রাখতে হবে।

আরও নানান ধরনের ছাড় এর ব্যবস্থা আছে যার সন্ধান যোগ্য কর পরামর্শদাতারা আপনাকে দিতে পারেন। আয়কর আইনানুযায়ী মোট পাঁচ রকমের আয়ের উৎসের কথা বলা আছে যেগুলি হল -- ক) চাকরী (*ধারা ১৫ থেকে ১৭*) খ) বিষয়াদি / সম্পত্তি হতে আয় (*ধারা ২২ থেকে ২৭*) গ) ব্যবসা বা পেশাগত আয় (*ধারা ২৮ থেকে ৪৪বিডি*) ঘ) মূলধনী আয় (*ধারা ৪৫ থেকে ৫৫এ*) ও ঙ) অন্যান্য উৎস হতে আয় (*ধারা ৫৬ থেকে ৫৯*)।

কোনো ব্যক্তির উপরোক্ত এক বা একাধিক উৎস থেকে আয় হতে পারে এবং সেই সমস্ত আয়ের মোট যোগফল আয়ের উর্দ্ধসীমা (প্রথমেই উল্লেখ আছে) অতিক্রম করলেই তাঁকে আয়কর দিতে ও রিটার্ন দিতে হবে সঠিক সময় সীমার মধ্যে।

কোনো আয়ের কোনো একটি উৎস থেকে (মূলধনী ক্ষতি ছাড়া) যদি ক্ষতি (loss) হয় তাহলে একই অর্থবর্ষের বা একই কর নির্ধারণ বর্ষের মধ্যেই আয়ের অন্যান্য উৎসের সাথে সেই ক্ষতি বিয়োগ করা যেতে পারে।

কেবলমাত্র মূলধনী ক্ষতি, মূলধনী আয় হতেই বিয়োগ বা set off করা যাবে। ব্যবসা সংক্রান্ত ক্ষতি কোনো অবস্থাতেই চাকরীর আয়ের সাথে বিয়োগ বা set off করা যাবে না।

কোনো অর্থবর্ষে যদি আপনার দেয় আয়করের পরিমাণ ১০,০০০/- টাকার বেশী হয় তাহলে আপনাকে অগ্রিম কর বা Advance tax দিতে হবে। মোট অগ্রিম করের ৩০ শতাংশ ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে, বাকি অগ্রিম করের ৩০ শতাংশ ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে ও বাকি ৪০ শতাংশ ১৫ই মার্চের মধ্যে প্রদান করাই নিয়ম।

আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো **টি.ডি.এস.(T.D.S)**, অর্থাৎ উৎস মূল থেকে কেটে নেওয়া আয়কর। আপনার ব্যাঙ্ক বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমানো ফিক্সড ডিপসিট / অন্য ডিপসিট থাকলে তার থেকে সুদ বাবদ প্রাপ্ত আয় বার্ষিক ১০,০০০/- টাকার বেশি হলে প্রাপ্ত সুদের উপর ১০ শতাংশ হারে ট্যাক্স কেটে নেবে ঐ ব্যাঙ্ক বা প্রতিষ্ঠান। এ থেকে বাঁচারও একটা উপায় আছে, এপ্রিল মাস নাগাদ ঐ ব্যাঙ্কে একটি ১৫জি (Form no-15G), সিনিয়ার সিটিজেন হলে ১৫ এইচ (Form no -15H) ফরম পূরণ করে দিলে ঐ সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে আপনার মোট আয় করযোগ্য আয়ের উর্দ্ধসীমা যেন অতিক্রম না করে। ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, একাউনট্যান্ট, টেকনিক্যাল কনসালট্যান্ট ইত্যাদি পেশার ব্যক্তিদের মোট প্রফেশনাল ফি বাবদ আয় ২০,০০০/- টাকার বেশী হলে প্রাপ্ত ফিসের উপর ১০ শতাংশ হারে টি.ডি.এস. কেটে নেবে ফি প্রদানকারী কোম্পানী।

আরও বেশ কিছু বিষয়ের উপর T.D.S কেটে নেওয়া হয়। তবে সব ক্ষেত্রেই উক্ত T.D.S কেটে নেওয়া সংস্থা অবশ্য বৎসরান্তে অরিজিনাল T.D.S certificate দিতে বাধ্য থাকেন। সার্টিফিকেটিতে টি.ডি.এস. সার্টিফিকেট প্রদানকারী সংস্থার TAN নং, সরকারী ট্রেজারীতে ট্যাক্স জমা দেওয়ার তারিখ সীল ও স্ট্যাম্প সহ সই অবশ্যই যেন থাকে দেখে নেবেন। যদি আপনার মনে হয় বাড়তি ট্যাক্স জমা দিয়েছেন বা বেশী T.D.S কেটে নেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে আপনি **রিফান্ড** (refund) চাইতে বা দাবী করতে পারেন আয়কর দপ্তরের কাছে, তার জন্য অবশ্যই আপনাকে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে যথা সময়ে। আর রিটার্ন ফর্মে আপনার ব্যাঙ্কের নাম, ব্রাঞ্চ, এ্যাকাউন্ট নং ও এম.আর. সি. আর. (MRCR code no.) উল্লেখ অবশ্যই করতে হবে। আপনার চেকের নং এর পর যে ৯ সংখ্যার নম্বরটি লেখা থাকে সেটাই MRCR code no.

এরপর তিনের পাতায়

মুদ্রক, প্রকাশক, স্বত্বাধীকারী শিবনাথ চক্রবর্ত্তী কর্তৃক অমরাগড়ী, হাওড়া থেকে প্রকাশিত এবং নিউ বাণী প্রেস কোম্পানী, অমরাগড়ী, হাওড়া ৭১১৪০১ থেকে মুদ্রিত।
email : jelarkhabar@rediff.co.in যোগাযোগ ঃ গ্রাম ও পোঃ-- অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া। **সম্পাদক শিবনাথ চক্রবর্ত্তী। ফোন নং ৯৮০০২৮৬১৪৮**
Owned by Shibnath Chakraborty and Printed at New Bani Press Co. Amoragori, Jaypur, Howrah and published at Amoragori, Jaypur, Howrah. **Editor - Shibnath Chakraborty. Contact No. 9800286148**